বাতায়ন

মুর্শিদাবাদে বৈষ্ণব আন্দোলন এবং তার প্রভাব

এমিলি রুমি

মধ্যযুগে বাংলাদেশে নানারকম ধর্মবিশ্বাসের অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই—শৈবধর্ম, শাক্তধর্ম, নানান লোকধর্ম ইত্যাদি। গ্রাম্যসমাজে পূজা পেতেন বহু দেবদেবী—মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী; এমনকী পঞ্চানন্দ, ব্রহ্মদৈত্য, বাবাঠাকুর, পীর। সর্বোপরি ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্কার ও কৃত্যসমূহ। এই পরিমণ্ডলে বৈষ্ণবধর্ম, চৈতন্যদেব ও তাঁর অনুগামীদের কিছুটা সংগঠিত কর্মকাণ্ডের ফলে বিশিষ্টতা অর্জন করে।[১] বাংলার বৈষ্ণব আন্দোলনে দুটি ধারার মিলন ঘটেছে। পাল যুগ থেকে এই মিথস্ক্রিয়া শুরু হয়েছিল। একটি হল বৈষ্ণবীয় ধারা, অন্যটি বৌদ্ধ ও হিন্দু ঐতিহ্য। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে থেকেই বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম ছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের নেতৃত্বে বৈষ্ণব আন্দোলন বাংলার সমাজজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। পূর্ব ভারতে বৈষ্ণব আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ও প্রচারক ছিলেন তিনি। তাঁর আকর্ষণে পূর্ব ভারতের অসংখ্য মানুষ, এমনকী নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলিমরাও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।[২] মুর্শিদাবাদ ছিল সুবে বাংলার রাজধানী। অষ্টাদশ শতকে এই জেলায় নানান মত, নানান ধর্ম, নানান শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে বহু পণ্ডিত, উলেমা ও রাজকর্মচারী নবাবদের দরবারে আসতে থাকেন। এই মিশ্র জনগোষ্ঠী এ-অঞ্চলের অর্থনীতি, ভাষা এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধ করেছিল। নবাবি শাসন, ব্যবসাবাণিজ্যের বহুল প্রসার, নানা বৃত্তি ও নানা পেশার মানুষ এখানকার সামাজিক রীতিনীতি ও বন্ধনকে শিথিল করে দেয়। ব্যবসাবাণিজ্যের সূত্রে সমৃদ্ধি লাভ করায় অব্রাহ্মণ জনতা নিজেদেরকে নিজ জাতিগোষ্ঠীর থেকে আলাদা করে নিয়েছিল। বিভিন্ন বৃত্তিজীবী তাদের বৃত্তির উন্নয়ন ঘটিয়েছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণরাও এই সমাজ-সচলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে। ঐতিহাসিক সুশীল চৌধুরি বলেন, নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদে একটি ‘Composite Culture’ বা উদার ও মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।[৩] ষোলো-সতেরো শতকের বৈষ্ণব আন্দোলন এই মিশ্র সমাজব্যবস্থার সুযোগ নেয়।

পঞ্চদশ শতকের শেষ ও ষোড়শ শতকের প্রথম থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটে। শ্রীচৈতন্য রাঢ় পরিভ্রমণকালে কান্দি অঞ্চলের আলুগ্রাম, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়েছিলেন। এই জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীনিবাস আচার্যের

বংশধরেরা এখনও বাস করেন। মালিহাটি, মানিক্যহার, সোমপাড়া, দক্ষিণখণ্ড, বুধুইপাড়া ইত্যাদি এঁদের আবাসস্থলগুলি বৈষ্ণবচর্চার কেন্দ্রস্থল হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছিল।[৪]

চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ, পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ, নৃসিংহ কবিরাজ ও বিশ্বনাথ কবিরাজ মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে জেলার বৈষ্ণবধর্মের ক্ষেত্রকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য বিগ্রহ, তাঁদের আবির্ভাব, তিরোভাব উৎসব এ-জেলার মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ পার্বণ। অনেক শ্রীপাট এখন বিলুপ্তির পথে। তবে কিছু শ্রীপাট এখনও এ-জেলায় বৈষ্ণব ধর্মের ক্ষেত্রকে সজীব রেখেছে। গদাধর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ (বাণীনাথ) মিশ্রের পুত্র নয়নানন্দের বংশধরগণ এখনও মুর্শিদাবাদের ভরতপুরে থাকেন। সালারের স্টেশনের কাছে চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীপাট। কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে দ্বিজ হরিদাসের, ভগবানগোলার কাছে বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের, তেলিয়া বুধুরিতে রামচন্দ্র কবিরাজের শ্রীপাট আছে। তেলিয়া বুধুরিতে আরও অনেক বৈষ্ণব সাধক বসবাস করতেন।[৫] শ্রীচৈতন্যদেবের রামকেলি যাত্রা মুর্শিদাবাদে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর সেখান থেকে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুরের কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে গদাধর পণ্ডিতের বাড়িতে আসেন। সঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ এবং কেশব ভারতী। গদাধর পণ্ডিতের বংশধরদের গৃহে এখনও একটি গীতা আছে যেটি গদাধর পণ্ডিতের নিজের হাতে লেখা। এই গীতার পাণ্ডুলিপিতে শ্রীচৈতন্যদেবের লেখা তিন লাইনের একটি টীকা এবং তাঁর স্বাক্ষরও রয়েছে। রামকেলি পৌঁছনোর (১৫০৭-০৮) পূর্বে শ্রীচৈতন্য মুর্শিদাবাদের কান্দি, সৈদাবাদ, বুধুইপাড়া, গাম্ভিলা (জিয়াগঞ্জ), কিরীটেশ্বরী, তেলিয়া বুধুরি প্রভৃতি জায়গায় যান। ১৫১৫ সালে শ্রীচৈতন্যদেব দ্বিতীয়বার মুর্শিদাবাদে আসেন এবং বিভিন্ন শ্রীপাট পরিদর্শন করেন।[৬] অনেকের মতে ১৫০৭ নয়, ১৫১৫ সালে সুলতান হুসেন শাহের সময় তিনি রামকেলি যান; সেই সময়েই হুসেন শাহের মন্ত্রী রূপ ও সনাতন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

এই জেলার বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত। কোনও কোনও কেন্দ্রকে আখড়া বলা হয়, যেখানে সন্ন্যাসী সৈন্যরা নিয়মিত ডন বৈঠক করতেন, কুস্তি লড়তেন। বৈষ্ণব গুরুর জন্মস্থান 'ধাম', একাধিক বৈষ্ণব গুরুর মিলনক্ষেত্র 'মহাপাট' নামে পরিচিত। গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব নিদর্শন যথা মহাপ্রভুর হাতে লেখা পুঁথি বা স্মারক যেখানে আছে সেটি 'শ্রীপাট'।[৭] এই কেন্দ্রগুলি কেবলমাত্র ধর্মীয় জীবনই নয়, সমাজজীবনকেও অপরিসীম প্রভাবিত করেছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে এদের যোগ। নবাব, জমিদার ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তি থেকে শুরু করে নিম্ন শ্রেণির হিন্দু, মুসলমান সকলেই বৈষ্ণব গুরুদের দ্বারা প্রভাবিত। নবাব, জমিদাররা পৃষ্ঠপোষকতা করে জেলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। সুদূর রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশের সাধকরাও এই জেলায় আখড়া করেছিলেন। উত্তরপ্রদেশের মস্তারামজী মুর্শিদকুলি খানের আমলে মুর্শিদাবাদের অদূরে সাধকবাগে আখড়া স্থাপন করেন। নবাব তাঁকে দান করেন গোলাপবাগ। রানি ভবানীর পৃষ্ঠপোষকতাও তিনি পান। মীরজাফর ও মীরকাশিম জাফরাগঞ্জের বড় আখড়াকে সাহায্য করতেন। পরবর্তী কালে এই আখড়াগুলি ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এমনকী এরা বিভিন্ন জমিদারিও কেনে। জেলার অর্থনীতিতে এদের ভূমিকা হত উল্লেখযোগ্য। তাদের রায়তি সম্পত্তি জেলার বাইরেও থাকত।

বৈষ্ণব আখড়াগুলি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক

কাজে যুক্ত হত। তৎকালীন সমাজজীবনের অনেক চাহিদা তারা পূরণ করেছিল। গরিব-দুঃস্থদের সেবা ছিল তাদের প্রধান কাজ। আখড়ার মাধ্যমে কেউ কেউ টোল-বিদ্যালয় খুলতেন, কেউ ডাকঘরের জন্য পাকা ঘর ও জমি দান করতেন। কেউ আবার সহায়হীনদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতেন। এই কেন্দ্রগুলি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিরূপণেও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। এরা মুসলমানদের প্রতি ছিল সহনশীল। মুসলমানরাও এইসব কেন্দ্রে শ্রদ্ধা দেখাতে কার্পণ্য করেনি। সাম্প্রদায়িক মনোভাবও গড়ে ওঠেনি কারও মধ্যে।

ষোলো-সতেরো শতকে মুর্শিদাবাদে কয়েকটি বৈষ্ণব কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এই সংখ্যা আঠারো ও উনিশ শতকে বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও প্রশাসনের গুরুত্ব এই সংখ্যাবৃদ্ধির একটি কারণ। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি তাদের প্রয়োজন মিটিয়েছিল বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়ে। নিত্যানন্দের প্রেরণায় গোয়ালা সমাজ এবং সুবর্ণবণিক সমাজ দীক্ষা নেয় বৈষ্ণব ধর্মে। সুবর্ণবণিকরা ফিরে পায় হারানো মর্যাদা, যা তারা বল্লাল সেনের সমাজ সংস্কারের ফলে হারিয়েছিল। রাজশাহীর কায়স্থ নরোত্তম দত্ত বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিলে তাঁর প্রভাবে কায়স্থরাও দীক্ষিত হয়। মুসলমানদের অধীনে কাজ করার জন্য জাতিচ্যুত হয়েছিলেন রূপ ও সনাতন; তাঁরাও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়ে ফিরে পান হারানো সম্মান। গরিব ব্রাহ্মণরা বৈষ্ণব সমাজে অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা পায়। ব্যবসায়ে যুক্ত থেকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা আর্থিক দিক থেকে লাভবান হয় এবং সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করে। বর্ণসংকররাও এই ধর্মে যোগ দেয়।[৮] বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলির বিভিন্ন উৎসব- অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেসব মেলা হত জেলার বিভিন্ন প্রান্তে, সেগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। মেলাগুলির আয়োজন বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলির বৈভব, সামাজিক মর্যাদা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রমাণ। এইসব মেলায় হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোক মিলিত হত, এখনও হয়। ধর্মের সীমানা ছাড়িয়ে এই মেলাগুলি সামাজিক মিলনক্ষেত্র। অর্থনৈতিক লেনদেনেও মেলাগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় বা সমস্ত জেলা থেকেই কারিগরেরা তাদের পসরা নিয়ে মেলায় আসে, জেলার বাইরে থেকেও মানুষ আসে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে এই মেলাগুলির ভূমিকা লক্ষণীয়।[৯]

শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের মহিমা হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ সকলকেই আকৃষ্ট করেছিল। এই জেলায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বহু মানুষ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছে। মুসলমান বৈষ্ণব কবি সৈয়দ মুর্তুজার প্রভাব দেখা যায় জেলার সকল স্তরের মানুষের উপর। এই উদাসীন দরবেশ রাধাকৃষ্ণ পদাবলি ও গৌরাঙ্গ পদাবলি রচনা করেছিলেন। মুর্শিদাবাদের ছাপঘাটিতে তিনি আস্তানা নির্মাণ করেন। হিন্দু-মুসলিম সকলের শ্রদ্ধাভাজন এই মানুষটির সমাধি ছাপঘাটিতেই রয়েছে।[১০]

মুর্শিদাবাদের বৈষ্ণব কবিদের হাতে যে-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তা বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। মুর্শিদাবাদেরই গোবিন্দ দাস কবিরাজ বৈষ্ণব পদাবলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ব্রজবুলি ভাষার গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের ও অভিসারেরও তিনি শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর বাস ছিল তেলিয়া বুধুরিতে, যেটি পরে তীর্থস্থানে পরিণত হয়। ছন্দের ঝংকার, ভাষার প্রয়োগ, ভাবের গভীরতা গোবিন্দদাসের পদগুলিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে। সংস্কৃত নাটক 'সংগীতমাধব' এবং 'অষ্টকালীর একান্নপদ' তাঁর অন্যতম রচনা। তাঁর অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজ, পুত্র দিব্যসিংহ এবং দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যামও পদকর্তা ছিলেন। দ্বিজ হরিদাস আচার্য এবং তাঁর পুত্র জয়কৃষ্ণ দাসও খ্যাতিমান পদকর্তা। তাঁরা বাংলা ও

ব্রজবুলি ভাষায় বহু পদ রচনা করেছেন। নরোত্তম দাস ঠাকুর আর এক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকার ও পদকর্তা। তাঁর প্রার্থনা বিষয়ক পদগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'হাটপত্তন' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গোবিন্দ চক্রবর্তী অপর একজন উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব কবি। তিনি কাব্যরচনার সঙ্গে সঙ্গে গীতবাদ্য বিশেষত কীর্তনে পারদর্শী ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মুর্শিদাবাদ তথা সমগ্র বাংলার গৌরব। তিনি খুব অল্পবয়সেই বৈরাগ্যবশত বৃন্দাবনে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানকার বৈষ্ণবসমাজের কর্ণধার হন। বৃন্দাবনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত গোকুলানন্দ জিউ বিগ্রহ এখনও পূজিত হন। বৃন্দাবনে তিনি হরিবল্লভ নামে পরিচিত ছিলেন। পাণ্ডিত্য, রসবোধ, দার্শনিক জ্ঞান, ধর্মনিষ্ঠা ও ভক্তিতে তিনি অত্যুজ্জ্বল। তাঁর কৃত ভাগবতের টীকা বৈষ্ণবসমাজে অত্যন্ত সমাদৃত।

নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম চক্রবর্তী মুর্শিদাবাদের অপর উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব কবি। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী—সুগায়ক, বাদক, পাচক, কবি ও ঐতিহাসিক। অল্পবয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে যান এবং গোবিন্দ মন্দিরে পাচকের কাজ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তমবিলাস' ও 'শ্রীনিবাস-চরিত্র'। গৌরাঙ্গ বিষয়ক ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বহু পদ তিনি রচনা করেছেন।

অসাধারণ পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের জন্য শ্রীনিবাস আচার্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর সমকালীন বৈষ্ণবসমাজে এবং তার বাইরেও উচ্চ মর্যাদায় আসীন ছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার তাঁর শিষ্য ছিলেন; গুরুর স্মৃতিরক্ষার জন্য তিনি মালহাটিতে রাধাসাগর নামে একটি দিঘি খনন করিয়েছিলেন। রাধামোহনের বংশধরেরা এখনও মালহাটিতে বসবাস করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত গোপালগিরিধারী মন্দির রাধামোহনের পাটবাড়ি নামে পরিচিত। এখানে প্রতি বছর রামনবমী তিথিতে রাধামোহনের তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তিনি 'পদামৃতসমুদ্র' নামে একটি পদসংকলন গ্রন্থ রচনা করেন। 'মহাভাবানুসারিণী' নামে এই সংকলনের একটি সংস্কৃত টীকাও তিনি রচনা করেছিলেন।[১১]

মুর্শিদাবাদে বহু জাতি ও বহু ধর্মের মানুষের বসবাস। সকলেই নিজেদের উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেন। বৈষ্ণবরাও বহু মন্দির নির্মাণ করেছেন যেগুলি জেলার স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছে। বৈষ্ণব মন্দিরগুলির অধিকাংশই ছিল দালান মন্দির এবং সমতল ছাদবিশিষ্ট। এগুলিতে কখনও কখনও ইন্দো-ইসলামিক ও ইউরোপীয় শিল্পরীতির প্রভাব পড়েছে। স্বল্পমূল্য ও সহজসাধ্য বলে এই দালানরীতির মন্দিরগুলি বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। মন্দিরগুলির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মূলত জমিদাররা এবং স্থানীয় বিত্তশালীরা।[১২]

চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করে সতেরো, আঠারো ও উনিশ শতকে বাংলার চিত্রকলা অন্য মাত্রা পেয়েছিল। উচ্চকোটি ও লৌকিক—দুই ধারার শিল্পীরাই উপরিউক্ত বিষয়ে চিত্রকলা নির্মাণ করেছেন। মাধ্যম হয়েছিল পাটা, পট, মন্দিরগাত্র। এই চিত্রকলা নির্মাণে মুর্শিদাবাদ শৈলী অনুসৃত হয়েছিল।[১৩] গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের নিজস্ব কীর্তন ঘরানা—'মনোহরশাহী'। কালক্রমে তা বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করে। গোপাল দাস, রামচন্দ্র কবিরাজ, জ্ঞান দাস, নয়নানন্দ মিশ্র, মনোহর দাস আউলিয়া, গোকুলানন্দ দাস, কৃষ্ণবল্লভ দাস, বলরাম দাস প্রমুখ বহু খ্যাতনামা কীর্তনিয়ার জন্ম মুর্শিদাবাদে। এঁদের অনেকেই খেতুরির মহাবৈষ্ণব সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।[১৪]

মুর্শিদাবাদের লোকধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গেও বৈষ্ণব ধর্মের উল্লেখ করতে হয়। লোকধর্মরূপে যে-বৈষ্ণব ধর্মের কথা আমরা জানি তা ঠিক গৌড়ীয়

বৈষ্ণব ধর্ম নয়। তা উপসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ধর্ম, যা বৌদ্ধ সহজ ভাবধারা, হিন্দু তন্ত্র এবং কখনও কখনও সুফিবাদের দ্বারা প্রভাবিত। সুফিবাদের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বহু মুসলমান লোককবিকে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতরচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল।[১৫] সৈয়দ মুর্তুজার নাম আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি সুফি পীর হিসেবে এবং বৈষ্ণব সাধক হিসেবেও সমাদৃত। তাঁর সমাধির পাশেই রয়েছে তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামী আনন্দময়ীর সমাধি। উরুসের সময়ে এখানে হিন্দুরা 'আল্লা হো আকবর' এবং মুসলমানরা 'জয় মা কালী' বলে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।[১৬] কাজেই মুর্শিদাবাদের সমন্বয়ী সংস্কৃতির ধারায় বৈষ্ণব প্রভাব অনস্বীকার্য।

পরিশেষে বলা যায়, বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শ মুর্শিদাবাদের সব সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে সমাজসচলতার ধারাকে সজীব রেখেছে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রকেও সমৃদ্ধ করেছে। তবে এই ধর্মচর্চা আর আগের মতো সজীব নেই, যদিও শ্রীপাটগুলির সেবকরা পরিবর্তিত সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য নানান সংস্কারমূলক কাজে ব্রতী হয়েছেন। ✠

তথ্যসূত্র

১। দ্রঃ রমাকান্ত চক্রবর্তী, ''মধ্যযুগে বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম এবং তার প্রভাব'', অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি* (কে, পি বাগচি এন্ড কোম্পানি : কলকাতা, ২০১২), পৃঃ ১১৫

২। দ্রঃ সতীশ চন্দ্র, *মধ্যযুগের ভারত*, খণ্ড ১, ভাষান্তর : মুজিবুর রহমান ও সাবির আলি (বুকপোস্ট পাবলিকেশন : কলকাতা, ২০১৩), পৃঃ ২২৭

৩। দ্রঃ সুশীল চৌধুরী, *নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ* (আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা, ২০১১), পৃঃ ১৫৪

৪। দ্রঃ পুলকেন্দু সিংহ, *লোকায়ত মুর্শিদাবাদ* (নিউ অগ্রণী প্রেস : বহরমপুর, ১৯৮৫), পৃঃ ২১৬

৫। দ্রঃ ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ''মুর্শিদাবাদের বৈষ্ণব সাধক ও সাহিত্য'', *স্রষ্টা ও সৃষ্টি, মুর্শিদাবাদ, গণকণ্ঠ পত্রিকা* (বহরমপুর : ১৯৮৬), পৃঃ ১২৩-১২৬

৬। দ্রঃ অরূপ চন্দ্র, ''বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল মুর্শিদাবাদে শ্রীচৈতন্যের আগমন এবং রামকেলি যাত্রা'', সম্পাদক অরূপ চন্দ্র, *মুর্শিদাবাদ ইতিবৃত্ত*, খণ্ড ৫ (বাসভূমি : বহরমপুর, ২০২০), পৃঃ ৬৫-৬৬

৭। দ্রঃ শক্তিনাথ ঝা, ''মুর্শিদাবাদ জেলায় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিবৃত্ত'', *মুর্শিদাবাদ চর্চা পত্রিকা* (পুস্তক বিপণি : কলকাতা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১২০

৮। দ্রঃ দেবশ্রী দাস, *মুর্শিদাবাদ জেলায় সাংস্কৃতিক মুক্তধারা : ঐতিহাসিক সমীক্ষা* (প্রভা প্রকাশনী : কলকাতা, ২০০২), পৃঃ ৫০

৯। দ্রঃ দেবশ্রী দাস, *মুর্শিদাবাদের বৈষ্ণব শ্রীপাট* (চিকিতুষী প্রকাশনী : কলকাতা, ২০১৪), পৃঃ ২৮৩

১০। দ্রঃ তথ্যসূত্র ৫, পৃঃ ১২৯

১১। দ্রঃ তদেব, ১২৬-১২৯

১২। দ্রঃ তথ্যসূত্র ৯, পৃঃ ২৭৬

১৩। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ২৮১

১৪। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ২৭৪

১৫। দ্রঃ তথ্যসূত্র ১, পৃঃ ১৩২

১৬। দ্রঃ বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* (পুস্তক প্রকাশনী : কলকাতা, ১৯৫০), পৃঃ ৭৯০